

ঈমানবৃক্ষ

ঈমান ও তার শাখাসংক্রান্ত প্রামাণ্য ব্যাখ্যাসার

ড. ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ : মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ



গাডিয়ান

পাবলিকেশনস

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম অবয়বে। দেখিয়েছেন শ্রেষ্ঠ ধর্মের পথ। তিনিই আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং তাঁর প্রতি নাজিল করেছেন মহিমাম্বিত কিতাব আল কুরআন। ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খলিকিন। মহান আল্লাহর নিকট আরজি জানাই, তিনি যেন আমাদের সালাত ও সালাম নবিজির নিকট পৌঁছে দেন।

ঈমান ও তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই নিচের হাদিসটিতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে এসেছে আবু হুরায়রা র.এ-এর সূত্রে। নবিজি বলেছেন—

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

‘ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর সর্বনিম্ন শাখা— রাস্তা থেকে কোনো বস্তু সরিয়ে দেওয়া, যা মানুষের জন্য কষ্টদায়ক। অনুরূপ লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।’

আবু হুরায়রা র.এ বর্ণিত এ হাদিসটিই এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মূলভিত্তি। হাদিসটি প্রায় সকল বিখ্যাত সংকলন গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে। যেমন : বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। বর্ণনার ধারায় বৈচিত্র্য থাকলেও এর মূল আলোচ্য বিষয় ঈমানের শাখাসমূহ। এক বর্ণনায় তার সংখ্যা ৭০টিরও বেশি, অপর বর্ণনায় ৬০টি। তবে ৭০ শাখার বর্ণনাটি সম্ভবত অধিকতর বিশুদ্ধ। হাদিসে بِضْعٌ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যা তিন থেকে নয়-এর মধ্যে যেকোনো একটি সংখ্যাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা ৭৩ থেকে ৭৯ যেকোনো একটি সংখ্যার পরিমাণ হতে পারে।

এ বইয়ের আলোচনা চলবে মূলত এই একটি হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই। যার মাধ্যমে আমরা জানব—

ঈমান কী?

ঈমানের শাখাগুলো কী কী?

ঈমানকে কীভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে?

ঈমানের সুফল ও কল্যাণ কী কী?

মুমিন হওয়ার মানদণ্ড কী?

ঈমানের বিভিন্ন স্তরগুলো কী কী?

ঈমান সম্পর্কিত এ আলোচনায় আমরা অনেকগুলো কিতাবের রেফারেন্স ব্যবহার করব। তবে প্রধানত নির্ভর করব ইসলামি ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কিতাবের ওপর। এর রচয়িতা ইলমুল হাদিসের জগদ্বিখ্যাত স্কলার আল হাফিজ আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকি (রহ.)। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে (৪৫৮ হিজরিতে) তিনি ইন্তেকাল করেন।

বায়হাকি (রহ.) বহু কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর অন্যতম হলো—আল জামে লি শুআবিল ঈমান। কিতাবটি আজকাল ৩০ খণ্ডে পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ৩০ খণ্ডের বিশাল কিতাবটির পুরোটাই আবর্তিত হয়েছে এই একটি মাত্র হাদিসের ব্যাখ্যায়। বায়হাকি (রহ.) এখানে ঈমানসংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় পর্যালোচনা হাজির করতে চেয়েছেন। বইটির শিরোনাম ‘আল জামে’ থেকে সুস্পষ্ট; এটি ঈমানের শাখা-প্রশাখার ওপর একটি বিশদ কিতাব বা এনসাইক্লোপিডিয়া। আক্ষরিক অর্থেই একে গণ্য করা হয় ঈমানের বাস্তবতার ওপর রচিত সর্বকালের সর্ববৃহৎ তথ্যকোষ হিসেবে। ইমাম বায়হাকি (রহ.)-এর আগে ও পরে এ বিষয়ের ওপর এমন বিশাল কিতাব কেউ-ই রচনা করেননি। বইটির রচয়িতা সমগ্র পৃথিবীতে খুবই বিখ্যাত স্কলার হিসেবে পরিচিত। তবে তাঁর জীবনী আলোচনা এখানে বিশেষ প্রাসঙ্গিক নয়। আপনাদের প্রতি পরামর্শ— তাঁর জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে কল্যাণ তালাশ করবেন।

ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর বইটি শুরু করেছেন এই হাদিস দিয়েই, যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি। এরপর তিনি ঈমানের সকল শাখাগুলোর তালিকা প্রণয়ন করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই তালিকায় সর্বসাকুল্যে ঈমানের শাখা দাঁড়িয়েছে ৭৬টি। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ।

ঈমানের প্রতিটি শাখার আলোচনায় তিনি হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন। এজন্য কিতাবটিতে হাদিসের পরিমাণ প্রচুর। সংখ্যায় সেটা প্রায় ১০ হাজারের অধিক। ফলে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে কিতাবটির ওপর সুবিচার করা সম্ভব তো নয়ই; আলোচ্য বিষয়ের ওপরও নয়। তবে এই বইয়ের লক্ষ্য হলো— ঈমানের বাস্তবতা ও শাখা-প্রশাখা নিয়ে যথাসম্ভব পরিমিত আলোচনা করা।

প্রথমে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বলা হচ্ছে—ঈমানের উপাদান কেবল একটি নয়; বরং সত্তরেরও অধিক। একইভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার

উপায়ও বিস্তর। তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার প্রশস্ত রাজপথের সংখ্যা বিপুল ও বিচিত্র। নিশ্চিতভাবেই এটি আমাদের জন্য সুসংবাদ। কেননা, কারও জন্য একটি ইবাদত খুব কঠিন হলেও অন্যটি হয়তো সহজ। অতএব, কোনো একটি দিক আপনার কাছে কঠিন মনে হলেও হতাশায় হাল ছেড়ে দেবেন না। আল্লাহর নিকটবর্তী হতে আপনার জন্য রয়েছে আরও অসংখ্য পথ; অন্যান্য অনেক কাজ, যা আপনি সহজেই করতে পারেন।

হাদিসটি আমাদের দেখায়—ঈমান হলো মৌখিক সাক্ষ্য, কাজে বাস্তবায়ন এবং হৃদয়ের বিশ্বাস। আর এটাই এই হাদিসের একটি কল্যাণকর দিক। লক্ষ করুন, নবিজি বলেছেন—‘ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা রয়েছে।’ অথচ উল্লেখ করেছেন মাত্র তিনটি শাখার কথা। প্রথমে বলেছেন—‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’, যা একটি মৌখিক সাক্ষ্য। এরপর বলেছেন—‘রাস্তা হতে কোনো বস্তু সরানো, যা মানুষকে কষ্ট দেয়।’ উদাহরণস্বরূপ, ধারালো কোনো বস্তু বা পেরেক রাস্তায় পড়ে আছে। এটা তুলে নিয়ে রাস্তাকে নিরাপদ করুন। নবিজির সাক্ষ্যমতে, এই সহজ ও ছোটো কাজটিও ঈমানের একটি শাখা। তৃতীয়ত, তিনি বলেছেন—‘লজ্জার অনুভূতি’; আরবিতে যাকে বলা হয় **الحياء** (আল হায়া)। এটি ঈমানের এমন একটি শাখা, যা বিদ্যমান থাকে মুমিনের হৃদয়ে।

সুতরাং ঈমান কেবল একটি বিষয়ের নাম নয়। এতে রয়েছে এমন কিছু, যা আপনাকে বলতে হয়। যেমন—কালিমা। রয়েছে সেসব কিছু, যা আপনাকে করে দেখাতে হয়। যেমন : মানুষকে সাহায্য করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদি। এমনকী আপনি অন্তরে যা বিশ্বাস করেন, সেসবও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ঈমান একই সঙ্গে আপনার জিহ্বা, হৃদয় ও কাজের দ্বারা বিকশিত হয়।

আলোচ্য হাদিসের অন্যতম তাৎপর্য হলো—ঈমানের কিছু দিক আপনি দেখতে পাবেন না। এটি লুকায়িত। যেমন : কারও লজ্জা আছে কি না তা আপনার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। ঈমানের অপর দিকগুলো আবার প্রকাশ্য। ফলে সেসব আপনি দেখতে পারবেন। অতএব, কারও মধ্যে থাকা ঈমানের সকল উপাদান সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই সম্যক অবগত। আবার এমন কিছু উপাদান আছে, যার মাধ্যমে আপনি লোকদের বিচার করতে পারেন। যেমন : ব্যবসায়িক লেনদেন কিংবা বিয়ের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে দেখতে হয় ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্র ও শিষ্টাচার কেমন। কিছু মানদণ্ড এ রকম প্রকাশ্য। আর বাকিগুলোর খবর রাখেন কেবল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

সূচিপত্র

ঈমান ও বৃক্ষ	১৩
ঈমানের তাৎপর্য	১৯
আলোর আলো	২৭
ঈমানের পরিচয়	৩৪
ঈমান বনাম ইসলাম	৪২
ঈমানের ধাপসমূহ (ফাসিক, মুমিন ও মুহসিন)	৪৯
আল্লাহর প্রতি ঈমান (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)	৫৬
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ	৬৪
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	৭১
নবি-রাসূল ও আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস	৭৯
বিচার দিবসের প্রতি ঈমান	৮৯
তাকদিরের প্রতি ঈমান	৯৮
আল হুবু ফিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা	১০৫
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	১১২
অজু ঈমানের অধ্বক	১২০
আল্লাহর প্রতি ভয় ও প্রত্যাশা	১২৬
ঈমানের দশটি শাখার সহজ-সাবলীল আলোচনা	১৩৫
ঈমানের আরও দশটি শাখার সহজ-সাবলীল আলোচনা	১৪৩
ঈমান আনার লাভ	১৫৪
ঈমান হ্রাস ও বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ	১৭১

ঈমান ও বৃক্ষ

‘ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা-প্রশাখা (Branches) রয়েছে’—এই হাদিসটি নিয়ে আমরা ভূমিকা আলোচনা করেছি। শাখা-প্রশাখা (Branches) শব্দটি পরোক্ষভাবে বৃক্ষকে নির্দেশ করে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও নবিজির বিভিন্ন হাদিসে ঈমানকে প্রতীকী অর্থে বৃক্ষ বলা হয়েছে। যেমন : বুখারি উল্লেখিত ইবনে উমর রাঃ বর্ণিত হাদিসে নবিজি সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন—

‘এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যা মুমিনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তোমরা কী বলতে পারো, সে বৃক্ষটি কী?’

প্রশ্নটির সাথে সাথে নবিজি সাহাবিদের একটি সূত্র বলে দিলেন— ‘বৃক্ষটি চিরসবুজ’।

সাহাবায়ে কেলাম বৃক্ষটির নাম আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা বললেন—

‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের বলে দিন, সে বৃক্ষটি কী?’

নবিজি তাঁদের জানালেন—

‘খেজুর গাছ হলো সেই বৃক্ষ, যা মুমিনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।’

লক্ষণীয়, নবিজি ঈমান ও একজন মুমিন ব্যক্তিকে তুলনা করছেন চিরসবুজ খেজুর বৃক্ষের সাথে। অন্য একটি হাদিসে নবিজি বলেন—

‘যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ কমলালেবুর মতো, যার ঘ্রাণ স্নিগ্ধ আর স্বাদও মিষ্টি। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়, যা স্বাদে মিষ্টি, কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই।’

অনুরূপ এ হাদিসটিতেও মুমিন ব্যক্তিকে ফলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা গাছ হতেই উৎপাদিত হয়। ঈমান ও বৃক্ষ সম্পর্কিত আলোচনা পবিত্র কুরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

تُؤْتِي أَكْثَرَهَا طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ كُلٌّ حَيٌّ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ-

‘তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালিমা তাইয়্যিবা; যা একটি উত্তম বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় আর শাখা-প্রশাখা আসমান বিস্তৃত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।’ সূরা ইবরাহিম : ২৪, ২৫

আয়াতটিতে মহান আল্লাহ কালিমা তাইয়্যিবার প্রসঙ্গ টেনে বলছেন—তোমরা কি এই দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো না? অথচ এ কালিমার নমুনা হলো সেই সুন্দর বৃক্ষের মতো, যার মূল সুদৃঢ়ভাবে জমিনে প্রোথিত আর শাখা-প্রশাখাগুলো বিস্তৃত আসমানে। মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে এ বৃক্ষ সারা বছর ফল দিয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস রাঃ এই বৃক্ষরূপ কালিমার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন— ‘এটি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।’

মহান আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে মানুষকে ঈমানসহ আরও অনেক কিছু বুঝিয়েছেন, যাতে তারা চিন্তার রসদ খুঁজতে পারে। অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ঈমান সম্পর্কিত আলোচনায় চিরসবুজ খেজুর গাছ তথা সাধারণভাবে বৃক্ষের উল্লেখ সুস্পষ্ট।

ঈমানকে বৃক্ষের উপমায় পেশ করার হিকমাহ

এখন প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের প্রতীকী উদাহরণ পেশ করার হিকমাহ কী? ঈমান ও সুন্দর বৃক্ষের সাদৃশ্যপূর্ণ এ উপমার মধ্যে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত আছে?

ইবনে হাজার, আন-নববি, আত-তাবারি (রহ.)-এর মতো বহু বিখ্যাত আলিমগণ এ বিষয়ের ওপর কলম ধরেছেন। ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা-প্রশাখাসংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেসব রচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরব—

নবীজির ব্যবহৃত উপমাগুলোর মাঝে সবচেয়ে সুস্পষ্ট নমুনা হলো—চিরহরিৎ বৃক্ষ। তিনি বলেছেন, বৃক্ষটির মতো একজন মুমিনও চিরসবুজ। একজন মুমিন ব্যক্তির চিরসবুজ হওয়ার তাৎপর্য কী? কারণ, মুমিন সব সময় আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত ও সচেতন থাকে। আর সবুজ রং আশাবাদ, আত্মবিশ্বাস ও জীবনের প্রতীক।

ধরুন, আপনি মরুভূমিতে হারিয়ে গেছেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করছেন। হঠাৎই দেখতে পেলেন, সামান্য দূরে এক সারি সুন্দর খেজুর গাছ। আপনার মনের অবস্থা তখন সজীবতার তুঙ্গে উঠে যাবে। খুঁজে পাবেন বেঁচে থাকার আশা। আপনি নিরাপদ অনুভব করবেন। মানুষদের নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থল খেজুর গাছের মতো একজন মুমিনও অপরের আস্থার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে আপনাকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈবাহিক ইত্যাকার বিভিন্ন সমস্যা জীবনকে সংকটময় করে তোলে। ঈমান এ সমস্যাগুলোর মাঝে আপনাকে দেবে স্থির প্রশান্তি। সমস্ত সমস্যার তীব্র ঝড়ের মাঝে জোগাবে টিকে থাকার শক্তি। এজন্যই মহান আল্লাহ ঈমানকে তুলনা করেছেন এমন বৃক্ষের সাথে, যার শিকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। এটি জমিনে আপনার মজবুত ভিত্তি প্রস্তুত করবে। আপনি খুঁজে পাবেন জীবনের অর্থ। জীবন হবে অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের আবাস।

ঈমান বনাম ইসলাম

আমরা এ অধ্যায়ে ঈমানসংক্রান্ত ভিন্ন দুটি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব। এর প্রথমটি হলো ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক। আর দ্বিতীয়টি হলো— ঈমানের পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক এবং পার্থক্য

চলুন শুরুতেই জেনে নিই ঈমান, ইসলাম ও ইহসানসংক্রান্ত একটি হাদিস— যা হাদিসে জিবরিল হিসেবে প্রসিদ্ধ। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাঃ-এর সূত্রে।

‘একবার আল্লাহর রাসূল সঃ জনসম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন—“ঈমান কী?”

নবিজি জবাবে বললেন—“ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিয়ামতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।”

ওই ব্যক্তি আরও জিজ্ঞেস করলেন—“ইসলাম কী?”

নবিজি উত্তর দিলেন—“ইসলাম হলো আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করে সালাত প্রতিষ্ঠা, জাকাত আদায়, রমজানে সিয়াম পালন এবং যাবতীয় ইবাদত করা।”

ওই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন—“ইহসান কী?”

নবিজি বললেন—“আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন তাঁকে দেখছেন। আর যদি দেখতে না পান, তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে ঠিকই দেখছেন।”

হাদিসে উল্লেখিত জনৈক ব্যক্তিটি আর কেউ নন, ছিলেন আল্লাহর বার্তাবাহক স্বয়ং জিবরাইল রাঃ। এজন্যই এটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে হাদিসে জিবরিল নামে। হাদিসটিতে তিনটি বিষয় এসেছে—ইসলাম, ঈমান, ইহসান। আমরা মাঝে মাঝে বিজ্ঞ আলিমদের বলতে শুনি, ঈমানের

অবস্থান ইসলামের থেকেও ওপরের ধাপে। আর সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে ইহসান। ঠিক এভাবে—

- সর্বনিম্ন ধাপ—ইসলাম
- দ্বিতীয় ধাপ—ঈমান (ইসলাম থেকে এক ধাপ ওপরে)
- তৃতীয় ধাপ—ইহসান (এটি ঈমান থেকেও ওপরে অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তর)

এখানে সংশয় জাগে—ঈমান কী করে দ্বিতীয় ধাপ হতে পারে, যেখানে ঈমানের স্তম্ভগুলো সকল মুসলিমের জন্য প্রথম ধাপেই দরকার? তা ছাড়া পবিত্র কুরআনে ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু’ শব্দমালা ব্যবহার করে ৭৫-এরও বেশিবার আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ কি এসব ক্ষেত্রে তাদের সম্বোধন করেননি, যাদের ইসলাম আছে?

এর উত্তর খুবই সহজ। আমাদের বোঝা দরকার, ইসলাম ও ঈমান পরিভাষা দ্বয় পরস্পর সমার্থক কিংবা পরিপূরক হতে পারে। ঠিক রুহ এবং দেহের সম্পর্কের মতো। যখন আমি বলি ‘আপনার দেহ’, তখন আপনার দেহ ও রুহ উভয়টিই বোঝাই। এক্ষেত্রে দেহ ও রুহকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না। যেমন : আরবিতে ‘আনফুসাকুম’ দ্বারা রুহ এবং দেহ মিলে একত্রে একটা সত্তাকেই নির্দেশ করে। কিন্তু যখন বলা হয়—‘দেহ দুনিয়ায় থেকে যাবে, রুহ আখিরাতে চলে যাবে’, তখন তারা একে অপরের অর্ধেক অর্থ বহন করে।

এভাবে ঈমান ও ইসলাম পৃথক পৃথক স্থানে উল্লিখিত হলে তারা পরস্পর সমার্থক। শব্দ দুটি তখন একই বিষয়কে প্রকাশ করে। ফলে ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু’ বলার সময় ইসলাম শব্দটির ভিন্ন তাৎপর্য উল্লেখ না থাকলে তখন মোটাদাগে ইসলাম আছে এমন সবাইকে সম্বোধন করা হয়।

প্রত্যেক মুসলিমেরই ইসলাম, ঈমান ও ইহসান থাকতে হবে। সাধারণভাবে মুসলিম পরিচয়টি এই তিন জিনিসের সামগ্রিক সমন্বয়কে ধারণ করে। কিন্তু ঈমান ও ইসলাম শব্দটি যখন একসঙ্গে ক্রমান্বয়ে বা কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়, তখন ঈমান ইসলামের তুলনায় ওপরের ধাপের। আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। আরও লক্ষ করুন—

যদি ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একটি অপরটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আসে, তখন বাস্তবে তারা সমার্থকই বহন করে। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু’ বলার মাধ্যমে উদ্দেশ্য করেন—‘ওহে যারা ঈমান এনেছ বা ইসলাম গ্রহণ করেছ।’ এখানে যাদের ঈমান কিংবা ইসলাম আছে, সবাইকে একযোগে ডাকা হচ্ছে। ওপরের বা নিচের ধাপ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু’ মূলত এখানে ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আসলামু’-এর সমতুল্য।

আবার ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় ভিন্ন তাৎপর্যও বহন করে। এর উদাহরণ রয়েছে পবিত্র কুরআনে—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لِّمُتُومِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ-

‘বেদুইনরা বলল—আমরা ঈমান এনেছি। হে নবি! আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমাদের হৃদয়ে ঈমান এখনও প্রবিষ্ট হয়নি।’ সূরা হুজুরাত : ১৪

আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট, কিছু বেদুইন গোষ্ঠীর লোকেরা শাহাদাহ পাঠ করে নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের ঈমানের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং ইসলাম গ্রহণ করেছ মাত্র। আল্লাহ আদেশ করছেন, নবিজি যেন এটি তাদের জানিয়ে দেন—

لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا-

‘তোমরা ঈমান আনোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।’ লক্ষ করুন, এখানে ঈমান অপেক্ষাকৃত উঁচু ধাপ। আর ইসলামের স্তর তার ঠিক নিচে। ফলে তারা মুসলিম, কিন্তু মুমিন নয়। আরও সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে—

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ-

‘তোমাদের হৃদয়ে এখনও ঈমান প্রবিষ্ট হয়নি।’

তবে এটাও স্মরণ রাখা দরকার, একপর্যায়ে মুসলিম হিসেবে আমাদের একই সঙ্গে ঈমান ও ইহসান চর্চা করতে হবে। সেই অবধি এ তিনটি একই সাথে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। ঈমান ও ইসলাম বিষয় দুটি যে ভিন্ন অর্থও বহন করে, তা পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহেও বিবৃত হয়েছে।

বিচার দিবসের প্রতি ঈমান

ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর আল জামে লি শুআবিল ঈমান গ্রন্থে ঈমানের পরবর্তী শাখা হিসেবে বিচার দিবসের প্রতি ঈমান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাখ্যাগুলো পেশ করেছেন বেশ কিছু উপ-শিরোনামের আওতায়। তবে এখানে আমরা এগুলোর সামষ্টিক ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হাজির করব।

পবিত্র কুরআনের আলোকে বিচার দিবস

বিচার দিবস বা কিয়ামত দিবসের কথা পবিত্র কুরআনের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই বর্ণিত হয়েছে। এমন কোনো পৃষ্ঠা পাওয়া সত্যিই দুষ্কর, যাতে এই ব্যাপারে সরাসরি উল্লেখ নেই। এটা কুরআনে আলোচিত ঈমানের সর্বাধিক প্রচলিত স্তম্ভ।

খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মের বিভিন্ন শাখা পুনরুত্থান দিবসে ঈমান রাখলেও তৎকালীন সময়ে কুরাইশরা ছিল অবিশ্বাসী। তারা বলত—

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا-

‘আমাদের জীবন কেবল একটিই, আর তা এ দুনিয়ার জীবন।’ সূরা আনআম : ২৯

এজন্য পবিত্র কুরআনে পুনরুত্থান দিবস বারবার আলোচিত হয়েছে, যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। বিশেষত মাক্কি সূরাগুলোতে এ সম্পর্কিত বর্ণনা সংখ্যায় অধিকতর।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ- عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ-

‘তারা পরস্পর কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? সে মহা সংবাদের বিষয়ে কি তারা প্রশ্ন করছে?’ সূরা নাবা : ১-২

إِذَا الشُّمُسُ كُورَتْ-

‘যখন (কিয়ামত দিবসে) সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে।’ সূরা তাকভির

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ-

‘যখন (কিয়ামত দিবসে) আকাশ ফেটে যাবে।’ সূরা ইনশিকাক

এ রকম পরিচ্ছন্ন বর্ণনা আমপারায় প্রচুর পাবেন, যেগুলো পাঠ করলে মনে হবে—আপনি কিয়ামত প্রত্যক্ষ করছেন।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে বলছেন—

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ -

‘মানুষ দেখে নিক, তাদের কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবগে নির্গত তরল থেকে।’ সূরা তারিক : ৫-৬

মহান আল্লাহ এখানে মানুষকে তার জীবনচক্র খতিয়ে দেখতে উৎসাহিত করছেন; পর্যবেক্ষণ করতে বলছেন বৃষ্টির ধারা, উর্বর জমিন ও তার বুকে উৎপাদিত সুশোভিত ফসলের ময়দান। এতসব কী করে হয়? কীভাবে শুষ্ক ডাঙায় ডানা মেলে সবুজ বৃক্ষরাজি? আল্লাহ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চান— যে মহান সত্তা এত কিছু পারেন, তিনি অবশ্যই মানুষকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ বিদ্রূপের সুরে আমাদের দিকে ছুড়ে দেন এক গভীর দার্শনিক প্রশ্ন—

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُنَّ مِثْلٍ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ -

‘তবে কি আমি মুসলিমদের অবাধ্যদের মতোই গণ্য করব? তোমাদের কী হলো? এ তোমাদের কেমন বিচার?’ সূরা কালাম : ৩৫-৩৬

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ -

‘ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কি আমি সমান করে দেবো? মুণ্ডাকিদের কি করে দেবো দুষ্কৃতকারীদের মতো?’ সূরা সোয়াদ : ২৮

আল্লাহ এখানে মানুষকে এক অমোঘ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বিচার দিবসের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করছেন—পরহেজগার ও পাপী ব্যক্তির কি সমরূপ পরিণতি ভোগ করা সংগত? জালিম শাসকের বিচার কোথায় তাহলে? আমাদের সময়ের ফেরাউনরা সিরিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, লাখো মানুষ হত্যা করছে; আবার একই সঙ্গে জীবনযাপন করছে রাজকীয় ভোগবিলাসে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, মৃত্যুর পর যদি কিছু না-ই থাকে, তবে তাদের ন্যায়বিচার কোথায় হবে? সুতরাং অবশ্যই ন্যায়বিচার সংঘটিত হবে। আর সেটা হবে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই শাখা নিয়ে ইমাম বায়হাকি (রহ.) তাঁর *আল জামে লি শুআবিল ঈমান* গ্রন্থে ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। ঈমানের এ শাখাটি হলো—মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা আল হুবু ফিল্লাহ। ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি নিয়ে আলোচনা হয় খুবই কম।

বাবা-মায়ের একটি মৌলিক দ্রুটি

আমাদের পিতা-মাতারা প্রায়শই একটা মারাত্মক ভুল করে থাকেন। তাঁরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসার আগেই ভয় করার শিক্ষা দেন। ফলে সন্তান শুনতে শুনতে বড়ো হয়—‘এটা করলে আজাব, ওটা করলে জাহান্নাম।’ কিন্তু এ ধরনের আলোচনার পূর্বে মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণের বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই আল্লাহর ভয় নিয়ে কথা বলব। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ভয় দুটোই একসঙ্গে অন্তরে লালন করা জরুরি। যদি এ দুটি বিষয় একই সঙ্গে ধারণ না করেন, তবে আপনার সমাপ্তি ঘটবে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অপূর্ণ ও সংকীর্ণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

‘ভালোবাসা’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অনুভূতির নাম। মহান আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে এটি অন্যতম প্রধান ভিত্তিমূল। ভয় ও প্রত্যাশা পরের বিষয়; প্রথমে অবশ্যই আসতে হবে ভালোবাসা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ -

‘কতিপয় মানুষ যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের তাঁর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা

তাদের ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো।’ সূরা বাকারা : ১৬৫

আয়াতটিতে মহান আল্লাহ বলছেন—কিছু মানুষ আল্লাহ ব্যতীত জড় মূর্তির উপাসনা করে। তারা এই সব মিথ্যা প্রভুদের ঠিক তেমন ভালোবাসে, যেমনটা আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত।

এরপরই মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ -

‘অথচ যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা সবচেয়ে দৃঢ়।’ সূরা বাকারা : ১৬৫

আল্লাহ জানাচ্ছেন, মূর্তিপূজকরা তাদের মিথ্যা ঈশ্বরকে যতটা ভালোবাসে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারদের ভালোবাসা তার থেকেও বহুগুণ বেশি তীব্র। আল্লাহ আরও উল্লেখ করছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ -

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে; মহান আল্লাহ অচিরেই তাদের স্থলে এমন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যাদের তিনি (আল্লাহ) ভালোবাসবেন, আর তারাও তাঁকে (আল্লাহকে) ভালোবাসবে।’ সূরা মায়দা : ৫১

এ আয়াতে মহান আল্লাহকে ভালোবাসার অন্যতম শুভ পরিণাম প্রস্ফুটিত হয়েছে। যখন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসবেন, আল্লাহও আপনাকে ভালোবাসবেন।

আল্লাহকে ভালোবাসার মানদণ্ড

আল্লাহকে ভালোবাসার মানদণ্ড সম্পর্কে কুরআন বলছে—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ -

‘হে নবি! আপনি বলে দিন—যদি তোমরা তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, উপার্জিত সম্পদ যা তুমি অর্জন করেছ, সে ব্যাবসা যার মন্দা দেখার ভয়ে তটস্থ থাকো এবং সেই বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো—এ সবকিছু যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাদের পথে জিহাদ করার থেকেও অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।’ সূরা তাওবা : ২৪

এখানে আল্লাহ বোঝাতে চাচ্ছেন—তোমাদের ভালোবাসার অবস্থা যদি এই হয়, তবে তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারোনি। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই পরিবার, সম্পদ ও যাবতীয় মালিকানা থেকে বেশি হতে হবে।

আনাস رضي الله عنه বর্ণিত এক হাদিসে নবিজি তিনটি গুণের অধিকারী মানুষদের ব্যাপারে বলেছেন—

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ -

‘যার মধ্যে এ তিনটি গুণ রয়েছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে—

এক. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয়।

দুই. যে একমাত্র আল্লাহর জন্যই কোনো বান্দাকে ভালোবাসে।

তিন. কুফর থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তিদানের পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে যে ব্যক্তি এতটাই অপছন্দ করে, যতটা সে আগুনে নিষ্কিণ্ত হওয়াকে করে থাকে।’
বুখারি : ২১

সুতরাং মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা একটি মৌলিক অনুভূতি ও প্রধানতম প্রেরণা, যা একজন মুমিনের হৃদয়ে থাকা প্রয়োজন।

আল্লাহকে ভালোবাসি বলেই ইবাদত করি

কেন আমরা মহান আল্লাহর উপাসনা করি? এর প্রধান কারণ এই যে, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। কেননা, সত্যিকার ইবাদত কেবল ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় থেকেই আসে। ভালোবাসাহীন ভয়াত হৃদয় প্রায়শই ধর্মান্ধতা ও চরমপন্থার দিকে নিয়ে যায়। সাধারণভাবে বললে, সহিংসতাপ্রবণ বিপথগামী গ্রুপগুলো ঐতিহাসিকভাবে মহান আল্লাহর ভালোবাসার দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। তারা শুধু জাহান্নামের আজাব ও শাস্তির ভয়ে তটস্থ থেকেছে চিরকাল। আর এগুলো একধরনের ধর্মান্ধতার দিকে মানুষকে ধাবিত করে, যা ব্যক্তির হৃদয় কিংবা সমাজের জন্য মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হলো সেই প্রধানতম অনুভূতি, যা একজন প্রকৃত মুমিনের হৃদয়ে সযত্নে লালিত হয়।

কিন্তু আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি কেন?

প্রথমত, আমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসি। কারণ, তিনি আল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, আমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসি তিনি যা কিছু করেছেন সেগুলোর জন্য।

কেউ কেউ বলে থাকেন, সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে আমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসি। কিন্তু এ কারণটি দ্বিতীয় স্তরের। কেননা, আমাকে আপনাকে সৃষ্টি না করলেও তিনি আমাদের ভালোবাসা লাভের হক রাখেন। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণতা, নাম ও গুণাবলির জন্য সর্বদাই ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

ঐশ্বর্যপূর্ণ বিরাট কিছুকে দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলা মানব স্বভাবের মজাগত বৈশিষ্ট্য। সুন্দরের প্রতি এই সহজাত অনুরাগ ও উচ্ছ্বাস খুবই স্বাভাবিক প্রপঞ্চ। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে সূর্যাস্তের সৌন্দর্য কিংবা আকাশজুড়ে তারকারাজির বিচ্ছুরণ আমাদের বিস্মিত করে। তাহলে যিনি এ সবকিছুর স্রষ্টা, তাঁর প্রতি আমাদের কতটা সমীহ থাকা উচিত! তবে মনে রাখতে হবে— আল্লাহর প্রতি এ সমীহ ও ভালোবাসার প্রধান কারণ তিনি আল্লাহ। কেননা, আমরা যদি অস্তিত্বে না থাকি, তবুও মহান আল্লাহ নিরঙ্কুশ ভালোবাসা ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য।

লজ্জা

ঈমান সম্পর্কিত হাদিসে জিবরিলের শেষাংশে নবিজি বলেছিলেন—

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

‘আর লজ্জা ঈমানের অন্যতম একটি শাখা।’

আরবি ‘হায়া’ শব্দের অর্থ—শালীনতা, লজ্জা ও সৌজন্যতা। আর এ গুণটিকে নবিজি ঈমানের অন্যতম শাখা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

হায়া বা লজ্জা আসলে কী? হায়া (লজ্জা) ও হায়াত (জীবন) শব্দদ্বয় একই মাদ্দাহ বা উৎসমূল হতে উদ্গত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) উল্লেখ করেন—

‘হায়া হলো হৃদয়ের প্রাণ। শরীরের যেমন হায়াত আছে, তেমনি হৃদয়ের প্রাণ হলো শালীনতা। আর এটি ঈমানের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য।’

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে—

‘এক ব্যক্তি আরেকজন বন্ধু বা মুসলিম ভাইকে তিরস্কার করছিল এই বলে—“তুমি অনেক বেশিই লজ্জা পাও, তুমি অত্যন্ত লজ্জাশীল। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না!” নবিজি এ সময় তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন—“তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অন্যতম একটি অঙ্গ। লজ্জাশীলতায় কেবল শুভ পরিণামই রয়েছে। এর পুরোটাই কল্যাণময়।”’

অতএব, লজ্জা ও কল্যাণ পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। এটা সর্বজনবিদিত যে, নবিজির বিখ্যাত সাহাবি উসমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর লজ্জা ছিল সবথেকে বেশি।

একটি সহিহ বর্ণনায় এসেছে—

‘রাসূল ﷺ একবার বাড়িতে শুয়ে ছিলেন এবং তাঁর হাঁটুর নিচের অংশ ছিল অনাবৃত। আবু বকর ও উমর رضي الله عنه আসার পরও নবিজি সেভাবেই থাকলেন। একটু পর আরেকজন কড়া নাড়ল। জানা গেল, আগন্তুক হলেন উসমান رضي الله عنه। এটা শুনে নবিজি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশ আবৃত করলেন। উসমান رضي الله عنه প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষে চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি নবিজির

এমন বিশেষ সম্মানজনক আচরণ দেখে আবু বকর ও উমর রাঃ উভয়ই একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। তাঁরা নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—

“আপনি তাঁকে এমন রাজকীয় সম্মান দিলেন, অথচ আমরা আসার সময় তা করেননি। উসমান রাঃ-এর আগমনে আপনি এমনটা কেন করলেন?”

নবিজি জবাবে জানালেন—

“যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে, তাঁকে দেখে কী আমার লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?”

এখানে রাসূল সাঃ তাঁর সাহাবিদের আবু বকর ও উমর রাঃ-কে বোঝালেন, আমি তোমাদের সাথে বেশি ঘরোয়া আচরণ করি, কিন্তু উসমানের লজ্জা অনেক বেশি। ফলে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে নিজের পায়ের অনাবৃত অংশ ঢেকে কথা বলা প্রয়োজন ছিল। অতএব, নিঃসন্দেহে লজ্জা একটি ইতিবাচক গুণ।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

‘লজ্জা হলো এমন একটি গুণ, যা ব্যক্তিকে নিন্দনীয় কাজ হতে বিরত রাখে। ব্যক্তিকে ওইসব কাজ হতে বিরত রাখে, যেসব কাজ সমালোচিত হওয়ার যোগ্য।’

‘হায়া’ (লজ্জা) হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ। আপনি ভবিষ্যতে আফসোস করতেন এবং সমালোচিতও হতেন—এমন যাবতীয় গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে এটি আপনাকে হেফাজত করে। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিকে বাধ্য করেন সম্মানজনক ও আদর্শিক জীবনযাপনে। আলিমগণ বলেন—

‘যে গুণটি ব্যক্তিকে গুনাহের কাজ থেকে বাধা দেয়, তা হলো ‘হায়া’ (লজ্জা)। হায়া থাকলে আপনি গুনাহের কাজে আগ্রহী হবেন না; বরঞ্চ বিব্রতবোধ করবেন।

লজ্জার বিভিন্ন স্তর

সর্বনিম্ন স্তর : মানুষের সামনে লজ্জার অনুভূতি : হায়ার সর্বনিম্ন স্তর হলো— ‘মানুষের সামনে লজ্জার অনুভূতি’ থাকা। এটা বিধিসম্মত ও বৈধ লজ্জা। আমরা সবাই প্রকাশ্যে মানুষের সামনে কোনো গুনাহ বা অনুচিত কাজ করতে অস্বস্তিবোধ করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলার ব্যাপারটি উল্লেখ করতে পারি। এটি খুবই মামুলি নেতিবাচক বিষয় হলেও যারা এটা করেন, তারা আশেপাশে তাকিয়ে দেখেন কেউ আছে কি না। কেন লোকটি চারপাশে তাকিয়ে দেখে? কারণ, সে চায় না কেউ দেখুক—এ আবর্জনা তৈরির অপকর্মটি তার। এটাও মূলত ‘হায়া’র একটি উপাদান।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেকেই নিজের নেতিবাচক কাজে চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকে। আবার কারও কারও মনোভাব হলো—প্রকাশ্যে গুনাহ করে সবাইকে জানান দেওয়া। এমনটি কখনোই শোভনীয় নয়। কেননা, নেতিবাচক কাজ গোপন রাখা হায়ার সর্বনিম্ন স্তর। তবে এ স্তরে অবস্থান করা প্রশংসনীয় নয় মোটেই। কিন্তু গুনাহের কারণে লজ্জিত না হয়ে প্রকাশ করে বেড়ানো এর থেকেও অধিক নিন্দনীয়। অতএব, অন্তত এ লজ্জাটা

আপনার অবশ্যই থাকা উচিত, যা প্রকাশ্য পাপাচার থেকে নিবৃত্ত রাখবে। এজন্যই নবিজি বলেছেন—

‘আমার উম্মতের গুনাহগারদের মধ্যে যারা তওবা করেছে, মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে ক্ষমা করবেন। বাদ পড়বে কেবল একটি শ্রেণি। এরা হলো মুজাহিরুন।’ সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন— ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুজাহিরুন কারা?’ নবিজি জবাবে বললেন— ‘মুজাহিরুন হলো ওই ব্যক্তি, যে রাতের অন্ধকারে গোপনে কোনো পাপাচারে লিপ্ত হয়—যা কেউ দেখেনি, কেউ জানেনি এবং আল্লাহ স্বীয় আবরণ দ্বারা তার পাপ ঢেকে রাখেন। আর পরদিন সে অহংকার করে বলে, তুমি জানো আমি কি করেছি? আমি এটা করেছি, সেটা করেছি। এভাবে সে আল্লাহর দেওয়া আবরণ উঠিয়ে ফেলে।’

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই আধিপত্যশীল যুগে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষ আক্ষরিক অর্থেই ‘হায়া’ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনার জন্য এটা একদমই সঙ্গত নয় যে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর লাইক-কমেন্ট কিংবা বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা ফেসবুকে প্রকাশ করবেন। এটি ‘হায়া’ বা লজ্জার অভাবকেই স্পষ্ট করে কেবল। যদিও হায়ার এ সর্বনিম্ন পর্যায়ে তথা পাপাচার গোপন করা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, তবে এতটুকুও না থাকা অধিক নিন্দনীয়।

মধ্যম স্তর : নিজের সাথে লজ্জা অবলম্বন করা : এরপর দ্বিতীয় বা মধ্যম পর্যায়ের ‘হায়া’, যা মোটামুটি ইতিবাচক। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তরের সাথে অতিরিক্ত কিছু যুক্ত হয়েছে। একে বলা যেতে পারে বিবেক। এ পর্যায়ে আপনি যখন কোনো গুনাহ করতে যান, তখন অন্তর্নিহিত বাজে অনুভূতি ও অপরাধবোধের কারণে যথাসম্ভব দ্রুত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এমনটা ঘটে অভ্যন্তরীণ ‘হায়া’ বা আত্মমর্যাদাবোধের কারণে। কেউ কিছু না দেখলেও আপনি এভাবে নিজের সাথে লজ্জা অবলম্বন করেন। এটা হলো দ্বিতীয় বা মাঝামাঝি পর্যায়ের ‘হায়া’ (লজ্জা)।

আল্লাহর প্রতি ভয় ও প্রত্যাশা

ইতোমধ্যে আমরা ঈমানের প্রায় দশটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার আলোচনা সমাপ্ত করেছি। এখন আরও দুটি শাখা তথা আল্লাহর ভয় এবং তাঁর ক্ষমা ও রহমের প্রত্যাশা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হবে।

মহান আল্লাহর প্রতি ভয়

মহান আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করার ব্যাপারটি পবিত্র কুরআনে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ৫০টিরও বেশি আয়াত উল্লেখ করেছেন খাওফ ও খাশিয়া শব্দে। এই শব্দদ্বয় একে অন্যের সম্পূর্ণ সমার্থক নয়। খাশিয়াহ হলো অভ্যন্তরীণ ভয়। আর খাওফ দ্বারা নির্দেশিত হয় এমন সব সাধারণ ভয়, যা আপনার মাঝে স্বাভাবিকভাবেই থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوْنَ-

‘কোনো মানুষকে ভয় করো না; বরং আমার প্রতি ভয় লালন করো।’ সূরা মায়েরা : ৪৪

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ-

‘তাদের ভয় পেয়ো না, আমাকে ভয় করো।’

সূরা আলে ইমরান : ১৭৫

মহান আল্লাহর প্রতি ভয় লালন করলে আমাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত জান্নাত।

মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন—

وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ-

‘আর যারা মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।’ সূরা আর-রহমান : ৪৬

অতএব, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহর প্রতি খাওফ আমাদের জান্নাতে প্রবেশের মর্যাদা দান করবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ-

‘যারা দান করে সেখান থেকে, যা মহান আল্লাহ তাদের দান করেছেন এবং মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে—এটা জেনে যাদের হৃদয় ভীত হয়ে পড়ে।’ সূরা মুমিনুন : ৬০

এ আয়াত সম্পর্কে আয়িশা রাঃ নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আয়াতে যাদের হৃদয় ভয়ে ভীত থাকার কথা বলা হচ্ছে, তারা কি মদ্যপান, যিনা ও অন্যান্য সকল পাপাচারে লিপ্ত লোক? আর এর কারণে তাদের হৃদয় আতঙ্কগ্রস্ত?’

নবিজি জবাবে বললেন—

‘না, হে বিনতে সিদ্দিক! এরা হলো ওই সব লোক—যারা রোজা রাখে, সালাত আদায় করে, দান করে। তাদের হৃদয় ভীত থাকে এজন্য যে, হয়তো আল্লাহ তাদের এ ভালো কাজসমূহ কবুল করবেন না।’

এটাই হলো খাওফ ও খাশিয়া-এর উচ্চতম পর্যায়, যেখানে ধার্মিক ব্যক্তিরাত্ত ও শঙ্কায় থাকে।

ফেরেশতারাও আল্লাহর ভয়ে ভীত

মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এমনকী ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তটস্থ থাকে সর্বক্ষণ। ইরশাদ হচ্ছে—

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ-

‘তারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে, যিনি তাঁদের ওপরে আছেন।’ সূরা নাহল : ৫০

যদিও ফেরেশতাগণ পাপ-পুণ্যের হিসাব ও যাবতীয় শাস্তি হতে মুক্ত, তবুও তাঁরা মহান আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ, তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছে মহান আল্লাহর বড়োত্ত্ব ও মহত্ত্ব।

ঈমান আনার লাভ

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ঈমান ও তার শাখা-প্রশাখা। ইতোমধ্যেই ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহ আলোচিত হয়েছে, যার শুরু হয়েছিল ঈমানবৃক্ষের বিভিন্ন উপমা পর্যালোচনার মাধ্যমে। এ পর্যায়ে আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত ঈমানবৃক্ষের ফল তালাশ করব। আল্লাহর ভাষ্যমতে, এ ঈমানবৃক্ষ সারা বছর ফল দিতে থাকে আর আমাদের জন্য বয়ে আনে উপকার ও কল্যাণ। এখন এই উপকারিতাগুলো কী? কেন আপনি এ বৃক্ষ মালিকানায় রাখতে আগ্রহী হবেন?

ঈমানদার জান্নাতে যাবে

ঈমানের একটি অনিবার্য ফল হলো জান্নাত। এটি নিঃসন্দেহে ঈমানের অন্যতম বৃহৎ প্রতিদান। তবে এর থেকেও উৎকৃষ্ট আরেকটি ফল রয়েছে। আমরা আলোচনার শেষের দিকে তা উল্লেখ করব। সহজ কথায়, ঈমান জান্নাতে যাওয়ার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এটি আমাদের গভীর ধর্মতাত্ত্বিক সংলাপের দিকে নিয়ে যায়। তবে আমরা এখানে খুবই সহজভাবে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করব। নবিজি সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ-

‘মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’

যারা ইসলামের বাণী কস্মিনকালেও শোনেনি, তারা ন্যায়নিষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তি হলে আল্লাহর ক্ষমার আশা করা যেতে পারে। তবে এটা সুস্পষ্ট, ইসলামই জান্নাতে পৌঁছানোর একমাত্র উপায়। অন্য কোনো ধর্ম, উপায় বা পন্থা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ-

‘মহান আল্লাহর চোখে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন হলো ইসলাম।’ সূরা আলে ইমরান : ১৯

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা তালাশ করবে, তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।’ সূরা আলে ইমরান : ৮৫

এ ছাড়া একটি মুতাওয়াতির বর্ণনায় এসেছে—

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

‘যে ব্যক্তি বলবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

অর্থাৎ, কেউ এ কালিমা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকী যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ এবং এ কালিমা সম্পর্কে জ্ঞাত থেকেও জবানে ধ্বনিত করেনি, সেও বঞ্চিত হবে জান্নাতের সুখ্যাণ থেকে।

অতএব, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তথা কালিমাধারী মুমিনগণ ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুফল জান্নাতের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত ওয়াদা। তবে এটি কেবল মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কালিমার দাবি অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং আমলে বাস্তবায়ন।

জাহান্নাম থেকে রক্ষা

এ বিষয়টি প্রথমটির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেলেই জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ মিলবে। তবে এ দুটি একেবারে একই বিষয় নয়। জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি জান্নাতে প্রবেশের তুলনায় কম মর্যাদাসম্পন্ন। এটি বুঝতে আমাদের ঈমানের স্তর নিয়ে পূর্বোক্ত আলোচনা স্মরণ করতে হবে। সেখানে আমরা বলেছিলাম—ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর আপনাকে জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি দেবে ‘অবশেষে’। তবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া সম্মানজনক স্তর এটি নয়। আল্লাহ চান, আপনি আরও উচ্চ পর্যায়ভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করুন। আপনি কি ওই স্তরে যেতে চান? তাহলে ইসলামের পাঁচটি রুকনের ওপর আমল জারি রাখতে হবে; বেঁচে থাকতে হবে কবির গুনাহ থেকে। এগুলো করতে পারলেই আপনি মর্যাদার দ্বিতীয় ধাপে আছেন। এর ফল কী? এর মধ্য দিয়ে তারা মহান আল্লাহর নির্ধারিত ঈমানের স্তরে পৌঁছেছেন। ফলে নিশ্চিতভাবেই তারা নিরাপত্তা পাবে জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব হতে।